

# জল পালঙ্ক

## সোয়েব আল হাসান



জল পালঙ্ক  
সোয়েব আল হাসান

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

তাম্রলিপি : .....

প্রকাশক

এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি

তাম্রলিপি

৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ

এইচ এম খালিদ

বর্ণ বিন্যাস

তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ : .....

মূল্য : ৩৩৪.০০

---

Jal Palanko

By : Soyeb Al Hasan

**First Published : February 2023 by A K M Tariquul Islam Roni**

Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price: 334.00 \$ 7

ISBN : .....

উ | ৭ | স | র্গ  
হিমাদ্রিতা

যে মনের গহিনে এক হিমালয় ভালোবাসা পুষে রাখে আমার জন্য।

## ভূমিকা

টিএসসি থেকে বাসে করে গুলশান ফিরছি। জানালার পাশের সিটটা আমার বরাবরই প্রিয়। বাসের সিটে হেলান দিয়ে আকাশ দেখছি। নৈর্ঝরত কোণে মেঘ দেখছি। সেই মেঘের ভেতর প্রকাণ্ড বজ্রপাত হচ্ছে সেটাও দেখছি। দেখতে দেখতে আমি হারিয়ে গেলাম কোনো এক রহস্যময় জগতে। যেই জগতের অধিপতি অদৃশ্য কেউ। যিনি তার অপরিমেয় ক্ষমতা দিয়ে রহস্য বৃত্ত আঁকেন। সেই বৃত্তের মাঝে অন্য মানুষকে গোলকধাঁধায় ফেলেন। সেই ধাঁধা থেকে আর কেউ বের হতে পারে না। তিনি খ্যাপাটে ষাঁড় হয়ে খেয়ালখুশি মতো অন্য মানুষের জীবন নিয়ে খেলেন, মারেন, কাটেন। নির্বষ হয়ে যায় কারো কারো মানবজনম।

হঠাৎ বৃষ্টির ছাঁটে আমার হ্যালুসিনেশন কেটে গেলে আমিও মেলাতে লাগলাম গল্পের চিত্রপট। চরিত্রগুলো এক এক করে আমার চোখের সামনে এসে হাজির হলো। বাসায় যেতে যেতে তারা বিদ্রোহ শুরু করে দিল। আমি উপায়ন্তর না পেয়ে জল পালঙ্ক লেখা শুরু করলাম। ভেবেছিলাম জলের মতোই লেখা এগোবে কিন্তু এগোলো না। চরিত্রগুলো আমার উপর ভর করলো। বাস্তব রহস্যেই প্রায়াক্ষকার হয়ে এলো জীবন। সবকিছু কাটিয়ে আমি লেখা শেষ করলাম। লেখা শেষে দেখলাম, কিছু প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। কিছু রহস্যের আসলেই কোনো সমাধান নেই। এবার সেই রহস্য আমার পাঠকদের মাঝে ছড়িয়ে দেবার পালা! জীবন জানুক রহস্যের ধূমনীলেও জীবন সুন্দর!

সোয়েব আল হাসান

গুলশান ২, ঢাকা ১২১২



পত্রিকার পাতায় বিজ্ঞাপনটি দেখে চোখ আটকে গেল সায়হামের। একটি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। এটা কোনো সমস্যা না। সমস্যা হচ্ছে বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিত কিছুই নেই। শুধু লেখা—

জরুরি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

চেয়ারম্যানের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট

সরাসরি ইন্টারভিউ : ইয়াকিন গ্রুপ, ধানমন্ডি ২৭

এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা বলা নেই। কাজের ধরন বলা নেই। বেতনের কথা বলা নেই। সিভি পাঠানোর ব্যাপার নেই। সরাসরি গিয়ে ইন্টারভিউ দিতে হবে। এই আধুনিক যুগে এটা একটু অন্যরকমই বটে।

গত ছয় মাস ইন্টারভিউ দিতে দিতে হাঁপিয়ে উঠেছে সায়হাম। কোথাও কোনোভাবে চাকরি হচ্ছে না। একটা চাকরি ভীষণ দরকার সায়হামের। কতটা প্রয়োজন সেটা সে আর তার সৃষ্টিকর্তাই জানে। মা মুহসিনাত বেগম ও বোন তুরফাকে নিয়ে তার ছোট্ট সংসার। বোন অনার্স পাশ করে বসে আছে। ভেবেছিল মাস্টার্সটা বিয়ের পর করবে। কিন্তু দেখতে দেখতে দিন চলে যাচ্ছে অথচ বিয়ে হচ্ছে না তুরফার। ঘরেই হাতের কাজ করে টুকটাক। মা দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে অথই সাগরে পড়েছেন। বাবার পেনশনের টাকায় কোনোরকম সংসার চলছে। সায়হামের মাথায় এক সমুদ্র চিন্তা। ইদানীং কোনোকিছুই ভেবে কূল কিনার করতে পারে না। বসে বসে ভাবছে এই ইন্টারভিউটা দিতে যাবে কি না! সুযোগ কোনোটাই হাতছাড়া করা উচিত হবে না।

সায়হামের বাবা ছিলেন ব্যাংকের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী। বেতন যা পেতেন তা দিয়ে খেয়ে পরে বেঁচে থাকাই কষ্ট ছিল। তার উপর দুই ছেলেমেয়েকে পড়াশোনা করিয়েছেন। তুরফা অনার্স পাশ করেছে। সায়হাম মাস্টার্স করেছে। মেয়েকে বিয়ে দিয়ে যেতে পারেননি শরফুদ্দিন সাহেব। মেয়ের গায়ের রং ময়লা বলে বেশিরভাগ পাত্রপক্ষই পরে জানাবো বলে আর কোনোদিন জানায়নি। শরফুদ্দিন সাহেব উৎকর্ষ হয়ে থেকেছেন। অপেক্ষা করতে করতে অধিকতর বুড়ো হয়ে গেছেন। একমাত্র মেয়ের বাবাই বোঝেন ঠিক সময়ে মেয়েকে পাত্রস্থ না করতে পারার অসহনীয় যন্ত্রণা। তার মেয়ের মতো এমন গুণবতী মেয়ে আর কটা আছে এই পৃথিবীতে? মাঝে মাঝে খুব করে ভাবেন। অফিস থেকে ফেরার সময় পার্কের বেঞ্চিতে আনমনে বসে থাকেন অথবা দশ টাকার বাদাম কিনে চিবোতে থাকেন অথবা অর্ধনিম্নলিখিত চোখে চেয়ে থাকেন আকাশের দিকে। চিন্তার চৌহদ্দি পেরিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন অন্য মানুষ। রোজ রোজ বিমর্ষ মুখে বাসায় ফেরেন শরফুদ্দিন সাহেব। মাথায় তার রাজ্যের দুশ্চিন্তা। মেয়েটার বিয়ে হচ্ছে না, ছেলেটার চাকরি হচ্ছে না। নিজের টাকায় সংসারও আর ঠিকমতো চলছে না। এত এত না এর মধ্যে জীবন বিষিয়ে উঠেছে। নিয়তি, প্রকৃতি আর পৃথিবীর মানুষ সব যেন তার বিপক্ষে। অথচ জানামতে তিনি কোনো অন্যায় করেননি তার জীবনে। মানুষের ক্ষতি করেন না। ঘুস খান না। তবু তার সাথেই কেন এমন হয়?

একদিন সন্ধ্যা-সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলেন শরফুদ্দিন সাহেব। মৌচাক মার্কেটের পাশেই এক ঘিঞ্জি গলির নিচ তলায় তার তিন রুমের রঙহীন, পলেস্তারা খসা বাসা। কম টাকায় মোটামুটি একটা থাকার জায়গা। গ্যাস সমস্যা করলেও পানি যে ঠিকঠাক পাওয়া যায় এটাই তো অনেক। এখানে জ্যোৎস্নার রহস্যময় শুভ্রতা খোঁজা অর্থহীন!

আজ কেমন যেন অস্থির লাগছে তার। বাসায় ঢুকতে ঢুকতে তুরফাকে ডেকে এক গ্লাস পানি দিতে বললেন। তুরফা লেবু, আখের গুড় আর কালোজিরা দিয়ে শরবত করে আনলো। মেয়ের হাতে এমন শরবত দেখে চোখে পানি চলে আসলো শরফুদ্দিন সাহেবের। তুরফা বাবার কপালে হাত রাখতে রাখতে বললো, তোমার শরীর খারাপ নাকি বাবা? তোমার চোখে পানি কেন?

শরফুদ্দিন সাহেব পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখের পানি মুছে বললেন, নারে মা শরীর খুব একটা খারাপ না। তোদের জন্য বড্ড চিন্তা হয়। কিছুই করে যেতে পারলাম না আমি।

তুরফা খুকি মেয়েদের মতো আল্লাদী গলায় বললো, বাবা তুমি হচ্ছেো এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাবা। তোমার মতো বাবা যে পেয়েছি এই খুশিতেই তো আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে। আর কি চাই এক জীবনে বলো?

আরেক চোট চোখের পানি মুছলেন শরফুদ্দিন সাহেব। গলার শ্লেষ্মা পরিষ্কার করে জিভেঁস করলেন, তোর মা কই রে খুকি?

রান্না করে।

কী রান্না করে?

তোমার প্রিয় খাবার রান্না হচ্ছে বাবা। সহাস্যে বললো মেয়েটা।

কী খাবার? অবাক হলেন শরফুদ্দিন সাহেব।

বলো দেখি, বলতে পারো কি না। তুরফার চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

বলতে পারছি না খুকি।

গন্ধও পাচ্ছেো না?

উঁহু।

কী বলো?

হু।

শোনো, ট্যাঁড়স আর মিস্টি কুমড়ো দিয়ে কুচো চিংড়ি চচ্চড়ি। তোমার তো অনেক পছন্দ বাবা, তাই না?

হু। কিন্তু আমি গন্ধ পাচ্ছি না কেন? চোখ এমন ঝাপসা হয়ে আসছে কেন? গরমও লাগছে। টেবিল ফ্যানটা একটু বসার ঘরে নিয়ে আয় তো।

ফ্যান তো তোমার কাছেই বাবা। ফুল স্পিডে চলছে।

ওহ! তা হলে এত গরম লাগছে কেন?

দাঁড়াও আমি আরেকটা ফ্যান নিয়ে আসি বলে চিলের মতো উড়ে ভেতরের ঘরে গেল তুরফা। এসে দেখে বাবা সোফা থেকে শুয়ে পড়েছে ফ্লোরে।

দরদর করে শরীর থেকে ঘাম বের হচ্ছে। তুরফা ভয় পেয়ে মাকে ডাকতে গেল। মুহসিনাত বেগম বিজলির গতিতে ছুটে এলেন। সায়হাম বাড়িতে নেই। তিনি কী করবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। এমন হতবুদ্ধির সময় শরফুদ্দিন সাহেব তড়পাতে তড়পাতে মুহসিনাত বেগম ও তুরফার চোখের সামনে মারা গেলেন। মা আর মেয়ে নিখর, নিষ্কম্প হয়ে নির্লিপ্ত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। ঘরের দেয়ালে ত্রস্ত ভঙ্গিতে ডাকতে লাগলো একটা লেজকাটা টিকটিকি। অপর দেয়ালে শোভা পেতে লাগলো বহু বছর আগে তোলা সাদা কালো রঙের একটা ফ্যামিলি ফটোগ্রাফ। শরফুদ্দিন সাহেব তার অসহায় পরিবারকে অথই দরিয়ায় নিঃসঙ্গ রাত্রির মতো রেখে গেলেন। সায়হাম যখন বাড়িতে ফিরল তখন পুরো বাড়িতে চিংড়ি চচ্চড়ির শ্রাণ। অনেকদিন সে সবার সাথে বসে ভাত খায় না। আজ ভারি ইচ্ছে হলো সবার সাথে খোশ গল্প করতে করতে রাতের খাবার খাবে। কিন্তু বিধাতা সবার সব ইচ্ছা সবসময় পূরণ করেন না।

কপাল ভালো যে বাবা সরকারি চাকরি করতেন তাই সেখান থেকে প্রতিমাসে কিছু টাকা পাওয়া যায়। যেটা দিয়ে এই দুর্মূলের বাজারে কোনোরকম বাসা ভাড়া ও খাওয়া-দাওয়ার টাকা যোগাড় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কত দিন হবে কে জানে। সায়হামের কপালে চিন্তার ভাঁজ গাঢ় হয়। একটা চাকরি যেকোনোভাবেই ম্যানেজ করতে হবে। রাস্তার মোড়ে এক কাপ চা খেতে গেলেও এখন চিন্তা করতে হয়। এভাবে কী বেঁচে থাকা যায়? দিনকে দিন দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে দিগন্তল।

পৃথিবীতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা খোদার সবচেয়ে অসহায় সৃষ্টি। এদের কথা এরা আর সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কেউ জানে না। নিজের চোখও জানে না নোনা জলের বর্ষণে কতটা ধার! কতটা ক্ষার! কেউ কেউ মুখ লুকিয়ে অশ্রুট শব্দে কাঁদে। অকলঙ্ক জীবনের বাঁধন খুলে অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া বা হাত পাতা এই শ্রেণির মানুষের নীতিবিরুদ্ধ কাজ। তাই পৃথিবীতে এদের জন্য সব কাজই কঠিন, একমাত্র সহজ কাজ হচ্ছে রাতের আঁধারে কোনো এক উঁচু গাছে ফাঁস নিয়ে ঝুলে পড়া।

সাত পাঁচ বলুকিছু নিয়ে চিন্তা করতে করতে জট পেকে যাচ্ছে সায়হামের। যেভাবেই হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। দরকার হলে পরিচিত

মানুষের হাতে পায়ে ধরবে। পিয়নের কাজ করবে। যত ছোটো কাজ হোক সব করবে। তুরফাকে বাবা বিয়ে দিয়ে যেতে পারেননি। তুরফাকে বিয়ে দিতে হবে ভালো পাত্র দেখে। এই ঘিজ্জি গলির বাসাটা পালটাতে হবে। দম বন্ধ হয়ে আসে এখানে। তবু এখানে কেটে গেছে অনেকগুলো বছর। কত কত স্মৃতি এই বাসায়। বাবা মায়ের সাথে কত সুখের স্মৃতি। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে কোনো সুখের স্মৃতি নেই সায়হামের। চাকরি না পাওয়ার জন্য বাবা প্রায়ই খিটমিট করতেন। নৈরাশ্যপূর্ণ গলায় অভিসম্পাত করতেন। সায়হামও সবসময় বাসায় ফিরতো না। একসাথে খাওয়া হতো না। পিতা-পুত্রের ভাব বিনিময় হতো না। কত কত না এর আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিল অনুভূতি তার হিসাব নেই। মধ্যাহ্নের রুদ্রভৈরব রূপ বিরাজ করতো দুজনের মাঝে। এখন বাবা না থাকায় খুব করে মনে পরে এসব। বটবৃক্ষ ঝড়ে ভেঙে পরলে নিচের কুঁড়েঘর বোঝে ঝড়ের কী তেজ, ঝড়ের কী গেজ! মা তার শুধু আজীবন কষ্ট করেই গেল। মায়েরা বোধহয় এমনই। চির সর্বস্বসহা! নিজের হাজার অপ্রিয় জিনিসও সন্তানের জন্য প্রিয় হয়ে যায়। ঘুমকাতুরে মেয়েরাও বিয়ের পর এক বসাতেই যেন অনন্তকাল জেগে থাকতে পারে। করতে পারে দুর্বোধ্য, আরাধ্য সকল কাজ। কী বিশ্বাসের এই জীবন ও জগৎ!

শেষমেশ সায়হাম ইন্টারভিউ দিতে যাবে ঠিক করলো। কোথাও তার একটা চাকরি চাইই চাই। যেকোনো চাকরি। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ সব পারে, সব!



ইয়াকিন গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। সাতাশ নম্বর রোড, ধানমন্ডি। এত বড়ো বিল্ডিং দেখে হকচকিয়ে গেল সায়হাম। নিজের অসহায় পোশাকের দিকে তাকাতে লাগলো বারবার। ঠিকঠাক কেতাদুরস্ত না হলে এসব অফিসে আসা বেমানান। নিজেকে কতটুকু ফরম্যাল লাগছে সে বিষয়ে সন্দিহান হয়ে উঠল সে। হ্যাঁ সাদা শার্ট, খাকি রঙের একটা গ্যাভার্ডিন প্যান্ট আর নিউমার্কেট থেকে সাড়ে তিনশো টাকায় কেনা এক জোড়া কালো জুতো। মোটামুটি এতেই ওয়াকিবহাল সে। চাকরি পাবার পর নাহয় নিজেকে আমূল পালটে নেওয়া যাবে। নিজেকে এসব বলে আর শান্তনা দেয়া গেল না। গলা শুকিয়ে আসতে লাগল সায়হামের। এরকম এত বড়ো একটা কোম্পানির চাকরির বিজ্ঞাপন পত্রিকার সাদা কালো পেইজে দুই বাই চার ইঞ্চি কলামে হয় কী করে সে ভাবতে লাগল। কোনোভাবেই হিসেব মিলছে না। অভ্যর্থনা কক্ষে ঢুকে রিসিপশনিস্টকে বললো ইন্টারভিউয়ের কথা কিন্তু তিনি কিছু জানেন না বললেন। সায়হামের ক্র সামান্য কুণ্ঠিত হলো। সব ঠিকঠাক আছে তো! রিসিপশনিস্ট দুই তিন জায়গা বিরক্তমুখে ফোন করলেন, খকখক করে খানিকক্ষণ কাশলেন, টিস্যু দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন। এরপর বউয়ের সাথে ঈষদুষ্ট অপ্রয়োজনীয় দুই মিনিট কথা বলার পর গোমড়ামুখে বললেন, লিফটের দশে চলে যান।

সায়হাম সুবোধ বালকের মতো লিফটের দশে চলে গেল। তার ফাইলে কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, একাডেমিক ও প্রফেশনাল কোর্সের সার্টিফিকেট। এগারো তলায় ঢুকেই ভিরমি খেল সায়হাম। অফিস দেখে মনে হচ্ছে সম্রাট শাহজাহানের রাজ প্রাসাদ। একটু পরেই তিনি উজির, নাজির নিয়ে বিচার

কার্ঘ্যে বসবেন। পাইক পেয়াদারা এদিক-সেদিক ছোট্টাছুটি করছে। এমন অফিস এই জীবনে আগে কখনো দেখেছে বলে মনে করতে পারছে না সায়হাম। সে ঢোক গিলতে লাগল। তাকে ওয়েটিং রুমে বসতে দেয়া হয়েছে। কখন ডাক আসবে কে জানে।

সায়হাম দেয়ালে একটা পেইন্টিং দেখতে পেল। কেন জানি খুব পরিচিত মনে হচ্ছে। ও হ্যাঁ মনে পড়েছে স্যার জন এভারেট মিলাইসের ওফেলিয়া এটা। এই ছবিটার ভেতর অন্যরকম কিছু একটা আছে। ভয়, শঙ্কা নাকি সাহস? ওফেলিয়া ডুবে যাওয়ার আগে একটি নদীতে ভাসমান অবস্থায় গান গাইছে। মৃত্যু চিন্তা মাথায় আসলে একজন মানুষ কীভাবে গান গাইবে সেটা মাথার ভেতর ঢুকছে না সায়হামের। এখন ঘুরপাক খাচ্ছে শুধু এলোমেলো চিন্তা। হঠাৎ ভেতর থেকে ডাক এলো। একজন এসে বললো, স্যার আপনাকে যেতে বলেছেন। সায়হাম ভয়ে ভয়ে রুমে ঢুকল। বড়ো করে সালাম দিল। নাসিফ ইয়াকিন সাহেব সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি চোখ বুজে গ্রান হাবানো সিগার টানছেন। ঘর ভর্তি ধোঁয়া। সায়হামের কাশি আসতে লাগল। অনেক কষ্টে সে কাশি আটকালো। রুমের চারপাশে মোটা পর্দা টাঙানো। আলো প্রয়োজনের তুলনায় কম। দিনের বেলায়ও যেন আলো আঁধারির একটা খেলা করছে রুমের ভেতর। সে আলো রহস্যময়। স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইল সায়হাম।

তোমার নাম কী? চোখ বন্ধ করেই প্রশ্ন করলেন নাসিফ ইয়াকিন।

সায়হাম শরিফ।

কী করো তুমি?

পড়াশোনা শেষ করে চাকরি খুঁজছি স্যার।

কী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছ?

মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি।

কোথা থেকে?

ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।

ওখানে কোনো পড়াশোনা হয় আদৌ?

জি স্যার, হয় তো। ক্লাস কম হয়। নিচু গলায় উত্তর দিল সায়হাম।

আচ্ছা বলো তো আমি যে সিগারটা খাচ্ছি এটা কোন দেশের? কিছুটা সামনে ঝুঁকে জ্বলন্ত সিগার দেখালো নাসিফ সাহেব।

স্যার, সিগার জিনিসটা সম্পর্কে আমার কোনো আইডিয়া নেই। সত্যি বলতে আজকেই আমি সামনাসামনি প্রথম দেখলাম জীবনে। সিনেমায় দেখেছি অবশ্য। তখন ভেবেছি এটা মোটা সিগারেট।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন নাসিফ সাহেব। এরপর খানিকটা অবনত গলায় বললেন, ও আচ্ছা। আমার সিগার আসে কিউবা থেকে। ইন্টারভিউয়ের প্রথম প্রশ্নেই তো তুমি ফেল করে বসলে, চাকরি হবে কীভাবে? একথা বলেই আবার হোহো করে হাসতে লাগলেন তিনি। যে হাসির মধ্যে স্পষ্টত ত্রুতার ছবি।

সায়হামের মনে হতে লাগল এই মুহূর্তে সে এখান থেকে বেরিয়ে যাবে কিন্তু নিতান্তই ভদ্রতার খাতিরে সে বসে রইল।

নাসিফ ইয়াকিন সাহেব চোখ খুলেছেন। ভালো করে পর্যবেক্ষণও করেছেন সায়হামকে। তিনি হঠাৎ সায়হামকে চমকে দিয়ে বললেন, বেতন কত চাও বলো?

সায়হাম যেন আকাশ থেকে পড়ল। সে কি বলবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। বস্তুত সে জানেই না এই জবে তার কাজটা কী। সায়হাম কম্পমান স্বরে জিজ্ঞেস করল, স্যার আমার কাজটা আসলে কী?

কেন পত্রিকায় দেখেনি? ভাবলেশহীনভাবে জিজ্ঞেস দিলেন নাসিফ ইয়াকিন।

পত্রিকায় তো স্যার শুধু পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট লেখা ছিল, এর চেয়ে বেশি কিছু ছিল না।

নাসিফ ইয়াকিন আরেক চোট হোহো করে হাসলেন। ভ্রু নাচিয়ে বললেন, এর চেয়ে বেশি কি কিছু জানার দরকার আছে। এক লাইনের মধ্যেই তো সব উত্তর। আমার ব্যক্তিগত সহকারী। আমি যে কাজ করতে বলবো সেটা করবা। কোনো অফিসিয়াল কাজ না। মাঝেমধ্যে আমার কাজ থাকে। যখন কাজ থাকে তখন করবা। বাকি সময় ফ্রি। মাস গেলে বেতন পাবা।

স্যার, আমার কী কী কাজ করতে হবে? অসহায় চোখে জিজ্ঞেস করল সায়হাম।